চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের নিরিখে বিচার

অমিত কুমার দাস

অনুচিন্তন

বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান ধারা হল চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা। এ কাব্যের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে চোখ রাখলে তার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ক্রমবিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনে চোখ রাখলে মার্কসীয় সমাজ-অর্থনীতির রূপরেখাটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। চন্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিরা যখন মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন তখন মার্কসবাদের মতো কোন আধুনিক মতবাদের প্রচার হয়নি। সে বিষয়ে তাঁদের কোন ধারণা থাকার কথা নয়। তবে মার্কসবাদ যেহেতু আজকের দিনে একটি সর্বজনীন মতবাদ তাই সর্বদেশের সর্বকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় তার একটি ছাপকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনে মার্কসীয় সেই সেই দৃষ্টিকোণ বা সমাজ-বিবর্তনের রূপরেখাটিকে অনুধাবনের প্রয়াস আছে আলোচ্য নিবন্ধে।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি অতিপ্রাকৃত রসের আধার হলেও এগুলি যে বাংলার 'Product of the soil' -এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈত নেই। মঙ্গলকাব্যের কবিরা যে দেবতাদের উপলক্ষ করে সজীব মানুষের বাস্তব জীবনকথাকেই কাব্যের আধারে মূর্ত করে তুলেছেন, সে কথা আজকের দিনে বলাই বাহুল্য। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি সে অর্থেই বাংলার লৌকিক পুরাণ হয়ে উঠেছে, সমকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান ধারা হিসেবে চন্ডীমঙ্গল কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ কাব্যের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতটির দিকে তাকালে দেখা যায়, এর মধ্যে সমাজ বিবর্তনের একটি বহমান ধারা স্পষ্ট ক্রিয়াশীল থেকেছে। অরণ্যসভ্যতা থেকে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা হয়ে বৈশ্য সভ্যতা বা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভিমুখে তার বিস্তার। এই রূপরেখাটিকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের নিরিখে বিশ্লেষণের প্রয়াসেই এ নিবন্ধের অবতারণা।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি-সম্প্রদায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক অধিকারী ছিলেন না অবশ্যই। সে কাল ধনতান্ত্রিকতার যুগও নয়। মার্কসীয় মতবাদ যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি মতবাদ, তবু এর একটি সর্বকালীন গ্রহণযোগ্যতার জায়গা আছে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিরূপে ও তার বিবর্তনের ছবিতে তাই এর ভাব-রূপের একটি আভাসকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

সহ-শিক্ষক, শ্যামবাজার অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল, কলকাতা

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) মূলতঃ ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিশ্লেষক ছিলেন। ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা শুরু হয় প্রধানত কার্ল মার্কসের সময় থেকে। মার্কস ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই একটি চলক হিসেবে দেখেছিলেন। সমাজের দীর্ঘমেয়াদী বিবর্তনের ইতিহাসে ধনতন্ত্রকে একটি ক্ষণস্থায়ী বিলীয়মান ধাপ (transitory phase) হিসেবে পরিগণিত করেছিলেন। ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা যাকে বলেছিলেন নৈসর্গিক আইন (natural law) মার্কস তাকে সাময়িকভাবে কার্যকরী আপেক্ষিক আইন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। তাঁর অভিমত সামাজিক পরিবর্তনের মূলে কাজ করে চলেছে। সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির (productive powers) মৌলিক এবং অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি। এরই ফলে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটছে এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পরিবর্তন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায়। সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নতিতে সমাজ-পরিবর্তন সাধিত হলে নতুন পরিবেশে পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা লোপ পায় বা সেগুলি জীর্ণ হয়ে পড়ে। এই জীর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিই তখন নতুন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা (fetters) হয়ে ওঠে। আর্থিক অগ্রগতির স্বার্থে তখন এদের অপসারণ আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

চন্ডীমঙ্গলকাব্যেও সমাজ নিজেই যেন একটি পরিবর্তনশীল চলক। এই পরিবর্তনের মূলে ক্রিয়াশীল থেকেছে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্রিয়াশীলতা। কাব্যকাহিনীতে প্রথমেই দেখি কালকেতু-ফুল্লরার আরণ্যক জীবনের ছবি। অন্তত তাঁদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক দিকটি যে অরণ্যে পশু শিকারের উপর কেন্দ্রিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেবী চন্ডী কালকেতুকে সাতঘড়া ধন দান করেন এবং অরণ্য কেটে নগর পত্তনের কথা বলেন। সেই অনুসারে কালকেতু বেরুণিয়াগণের সাহায্য নিয়ে বন কেটে নগর পত্তনের উদ্যোগ নেয়—

> "শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ।
> ওকড়া বোকড়া কাটিল অপাঙ্গ।
> আকড়া মাকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি।
> আটসর খাটসর কাটিল নাটা।
> ভাদুল্যা ভারুল্যা চোর পালিটা।
> ঝোকড়া ঝাউ কাটে হাফরমালী।..."[১]

বস্তুত এরই ফলশ্রুতিতে অরণ্যসভ্যতার স্থলে কৃষিসভ্যতার পত্তন ঘটে। উৎপাদনের উপাদান বা শক্তিগুলির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় সমাজের প্রকৃতিতে এভাবেই পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু বন কেটে নগর পত্তনের দ্বারা সমাজের যে অর্থনৈতিক ক্রমোচ্চশীলতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে বাধ্য হয়ে, তাতে বাধ্য হয়ে দাঁড়ায় বনের ব্যাঘ্রাধিপতি। সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে উপাদানগুলির এই দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াশীলতার কথা মার্কস বহুমুখে বলেছেন। এই দ্বন্দ্বের পথ বেয়েই সমাজে আসে নতুন পরিবর্তন, কোন মসৃণ বাধাহীন সড়কপথে তা অনায়াসে গড়িয়ে চলে না।

যদি ধরে নিই, চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাঘ্রাধিপতি আরণ্যক সভ্যতার রক্ষক, অর্থাৎ পুরনো প্রতিষ্ঠান, সুতরাং নতুন কালের জাগ্রত শক্তির প্রতিভূ কালকেতুর কাছে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ কাব্যেও তাই দেখি ব্র্যাঘ্র দেবতার সঙ্গে সংগ্রামে কালকেতুই বিজয়ী হয়েছে, বাঘের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে এবং কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার

প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। একে মার্কসীয় 'থিসিস' 'অ্যান্টি থিসিস' এর মধ্যে দিয়ে 'সিন্থেসিস'-এ পৌঁছানোর অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া হিসেবে নির্দেশ করা যেতেই পারে। কৃষিকেন্দ্রিক এই সভ্যতায় উৎপাদনের দুটি প্রধান উপাদান বা শক্তি হয়ে দাঁড়ায় ধান ও গোরু। গুজরাট নগর স্থাপনের পর কৃষিকেন্দ্রিক নগর পত্তনের পরিকল্পনায় দেবী ভগবতী এই দুই উপাদানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কালকেতুকে দিয়ে সমাজের এই দুই শক্তিশালী উপাদানের বিলিবন্দোবস্তের বিষয়ে আভাস দিয়ে তাই বুলান মন্ডলকে বলেছেন—

"শুনিয়া এ মত মাতা পদ্মার ভারতী।
কলিঙ্গে প্রজারে স্বপ্নে কন ভগবতী।।
নগর বৈসায় কালু বনের ভিতরে।
ধান্য গরু টাকাকড়ি দেয় সবাকারে।।
তোমারে বলিয়ে শুন বুলন মন্ডল।
তথা গেলে তোমাদের অনেক কুশল।।"[২]

কিন্তু চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী এখানেই থেমে থাকেনি। ধনপতি উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে কাহিনী ভবিষ্যৎগামী হয়েছে। ধনপতি উপাখ্যান বা বণিকখন্ডে ধনপতি সওদাগর এবং তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত সমাজের মুখ্য ও প্রাধান্য বিস্তারকারী বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিভূচরিত্র। তাঁদের মধ্য দিয়েই তৎকালীন বৈশ্যতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রতিফলন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সপ্তডিঙা সহকারে ধনপতির সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার মধ্যেই তার আভাস আছে। সুতরাং ব্যাধখণ্ডের থেকে বণিকখণ্ডে পুনর্বার সমাজ বিবর্তনের এই যে ধারা — অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ থেকে বৈশ্যতান্ত্রিক বা কিছু সঙ্কীর্ণ অর্থে ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর, একে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা চলে 'nevegation of nevegation'। অবশ্য ব্যাধখণ্ডেও আমরা বণিক মুরারী শীলের ছবি পাই, কিন্তু 'বাণ্যা' সেখানে বৃহত্তর সমাজ-প্রতিভূ নয়। কালকেতুই সেখানে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের সর্বায়তন মুখপাত্র রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

মার্কস জানিয়েছেন, আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষমতা (power) একটি অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। 'Capital' গ্রন্থে মার্কস এই বিশেষ প্রবণতার কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন। ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি সদম্ভে সামনে হাঁটেন এবং শ্রমিক—যার কাছে শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নেই—সে বিনীত ভাবে প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। একদিকে পুঁজিপতির ক্ষমতা, যার উৎস হল উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা। অন্যদিকে নিরন্ন, দুর্বল অভাবগ্রস্ত কৃষক শ্রেণী, যাদের সব দিক থেকেই হাত পা বাঁধা। এক্ষেত্রে এই অসম ক্ষমতা বিভাজনের কারণে ধনতন্ত্রে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এবং শ্রমিক শোষণে নিয়োজিত হয়। এই শ্রেণীস্বার্থের পরস্পর-বৈরিতার সম্পর্ককে মার্কস অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মার্কস দেখিয়েছেন, এই অসম ক্ষমতাবিভাজন প্রায় সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই দেখা যায়—সামন্ততন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং ভূস্বামীদের রাজত্বকালেও এই ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থেকেছে। এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতেই গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট বা মন্দা অবস্থা।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের দিকে তাকালেও আমরা অনুরূপ অসম ক্ষমতা বিভাজনের ছবিকে দেখতে পাই। এ কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তিক কারণ অংশে সমাজ জীবনের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে এর পরিচয় নিহিত আছে। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর মালিকানা থাকায় মানসিংহের রাজত্বকালে নিযুক্ত ডিহিদার মামুদ শরীফ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের দ্বারা প্রজাশোষণে নিয়োজিত হয়। ক্ষমতার বিষম বন্টনে প্রজার দুরবস্থা কি চরমে পৌঁছুতে পারে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তার ঐতিহাসিক ছবি এঁকেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ -ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।।
উজির হলো রায়জাদা বেপারিয়ে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।।
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপিনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছি নাহি পরিত্রাণে।।
পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হৈল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।।"[৩]

মার্কস একথাও জানিয়েছিলেন, ক্ষমতা বিভাজনের ফলে একদল লুন্ঠনকামী পরাশ্রয়ী জীব মালিক ও শ্রমিকের মাঝে মধ্যে কৌশলে নিজেদের স্থান করে নেয় এবং এদের জন্যেই শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। গ্রন্থোৎপত্তির পূর্বোক্ত অংশে মার্কস কথিত সেই লুন্ঠনকামী পরাশ্রয়ী ব্যক্তিদের স্বার্থান্বেষী স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উজির ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর শত্রুতে পরিণত হয়। ভূমি ও মুদ্রা সংস্কারের ফলশ্রুতি হিসেবে অধিক পরিমাণ জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার জন্য অনুর্বর ও অকর্ষিত জমিকেও আবাদী বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে অবৈধ করের চাপে প্রজাদের অবস্থা বিপন্ন হয়। ক্ষমতা বা শক্তিপুঞ্জের একদিকে রাজা মানসিংহে অবস্থান ধরলে অন্যপক্ষ হিসেবে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ছবি চোখে পড়ে। সুতরাং উজির, ডিহিদার, পোদ্দার, সরকার—এইসকল পরাশ্রয়ী মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিদের সমষ্টিগত শোষণের প্রকোপই এখানে ব্যাপক ও গভীর। দ্বিজমাধবের কাব্যে হাটুরিয়াদের উপর রাজানুগৃহীত ভাঁড়ুদত্তের অত্যাচার ও অন্যায়ভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আদায়-দৃশ্যের বিস্তৃত বর্ণনায় এর পরিচয় মেলে।

বিপন্ন প্রজারা তাই এমতাবস্থায় চেয়েছে কবি মুকুন্দেরই মত সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে অনিশ্চিত নিরুদ্দেশ জীবনের পথে পাড়ি দিতে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পেয়াদারা 'দুয়ার চাপিয়া দেয় হানা'। তাই গৃহস্থালীর অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ধান ও গোরু বিক্রি করেও রাজস্ব পরিশোধের প্রয়াস নেয়। কিন্তু সে সকল দ্রব্য কেনার মত সঙ্গতি ছিল না কারুরই। অগত্যা নিরুদ্দেশ জীবনের পথে পলাতক হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। ক্ষমতার

এই অসম বন্টনের পথেই যে সমাজে অসম আয় বিভাজন গড়ে ওঠে তার কথা মার্কস বলেছেন। এই অসম আয় বিভাজনই গড়ে তোলে শ্রেণীবিভিক্ত সমাজ ব্যবস্থা। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে সেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছবি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কিংবা পশুদের ক্রন্দন অংশে বিবিধ শ্রেণীর পশুর রূপকের আড়ালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটি আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামের কথাকে মার্কস বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—তার অনিবার্যতা সম্পর্কে বিতর্ক যাই থাক না কেন। ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ধনতন্ত্রের একটি মৌলিক ব্যাধি বলে উল্লেখ করেছিলেন মার্কস। এই একচেটিয়া শক্তি একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ায় একটি অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা ধনতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যেই গড়ে ওঠে। এই একচেটিয়া শক্তি ক্রমে মুখোমুখি হয় দলবদ্ধ ও সমাজ সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম বাধে তা ভয়ঙ্কর।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নয় কখনোই। তবে কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক কৌলিন্য যে ধীরে ধীরে কাঞ্চন কৌলিন্যকে বরণ করে নিচ্ছিল তার আভাস এ কাব্যে স্পষ্ট। কালকেতুর জীবনের বিবর্তন তারই পরিচয়বাহী। যাইহোক, এ কাব্যেও দেখি বীর কালকেতু একদা অরণ্যের পশুদের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে ওঠে। তার প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে তাই একদা তারা পশুরাজ সিংহের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল লড়াই শুরু করে। এই শ্রেণীসংগ্রাম ক্ষমতার একচেটিয়া প্রয়োগেরই ফলপরিণাম বলে ভাবা যেতে পারে। কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুদত্তের বিরুদ্ধে হাটুরিয়াদের অভিযোগের মধ্যেও এরই একটি সূক্ষ্ম সুরকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

যদি এ-কাব্যে পশুদের ক্রন্দনকে নিপীড়িত প্রজাসাধারণের ক্রন্দনের রূপক হিসেবে পরিগণিত করা হয়, তাহলে কালকেতুকে প্রজাপীড়ক বা শ্রমজীবীর স্বার্থের পরিপন্থী একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী প্রবল প্রতাপশালী শ্রেণী-প্রতিভূ হিসেবে ভাবা আদৌ দোষের কিছু নয়। দেবী চন্ডীর কাছে পশুদের অভিযোগের মূল সুরটি কিন্তু অনুরূপ বিশেষ ভাবনার তারেই বাঁধা। সেই ক্ষমতাবানের শোষণে ও পীড়নে সাধারণ প্রজাদের কি দুরবস্থার সৃষ্টি হয়, কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পশুদের ক্রন্দনের মধ্যেই তার পরিচয় নিহিত আছে। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি চয়ন করা যেতে পারে, যা জানান দেয় সে ক্রন্দন আদতে এক পশুর হলেও তা পীড়িত শোষিত সমকালীন প্রজাদেরই আর্ত অভিব্যক্তি—

"উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।
সাতপুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল-পাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে।।
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
মাগু মৈল পো মৈল দুটি নাতি শেষে।।
কান্দয়ে ভাল্লুক শিরে মারে করাঘাতি।
জরাকালে হইল মোর এতেক দুর্গতি।।[৪]

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সংস্কার যে ধনতন্ত্রের অনেক ত্রুটি দূর করতে সক্ষম একথা মার্কস বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সংস্কারের দ্বারা ধনতন্ত্রের সম্ভাব্য অনেক কুফলই দূর করা যায় এবং

তার দ্বারা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের যে তীব্র ও বৈপ্লবিক ক্ষোভ তা অনেকটাই প্রশমিত করা যায়। সংস্কারের ফলে এমনটা যে ঘটতে পারে তা মার্কসের অজানা ছিল না। তবে ধনতন্ত্রের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্বেষ দূরীভূত হোক, তা মার্কস চাননি। তাই শ্রমিক-স্বার্থে তৎকালীন যে বিশেষ সংস্কারগুলির প্রস্তাব করা হয়েছিল সেগুলির বিরোধিতা করা উচিত বলে মনে করেননি। তাঁর 'The Communist Manifesto' গ্রন্থে একারণেই দেখি অন্যান্য অনেক সংস্কারের সাথে ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বসানো, সকলের স্বার্থে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, শিশুশ্রমিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ইত্যাদির স্বপক্ষে তিনি মত পোষণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা উদারনৈতিক সংস্কারক হিসেবে খ্যাত তাঁদের অনেকেই যে 'The Communist Manifesto থেকে শিক্ষা নিয়েছেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই শতকে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থার (Welfare State) উদ্ভব মূলতঃ অনুরূপ চেতনা-প্রসূতিরই ফলপরিণাম।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে কিন্তু অস্পষ্টভাবে হলেও রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার জন্য মার্কসের ন্যায় নানা প্রকার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, যা শ্রমজীবী কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার অনুকূল। কলিঙ্গ রাজ্যে যে সকল কারণে প্রজা অসন্তোষের সূত্রপাত ঘটেছিল, কালকেতু তার নিরসনের দ্বারা এক আদর্শ নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে। বুলান মন্ডলের প্রতি কালকেতুর আশ্বাসবাক্যের মধ্যে এরই প্রতিফলন চোখে পড়ে। এ-ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থার একপ্রকার প্রাক-রূপ বলেই বিবেচিত হতে পারে—

"শুন ভাই বুলান মন্ডল।
আসাগা আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব কনক-কুন্ডল।।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টা নিশান মোর ধর।।
নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ী নানা বাবে যত কড়ি
নাহি নিব গুজরাট বাসে।।
পার্বাণী পঞ্চক যত পুড়া লোণ সোনা ভাত
ধানকাটি কলম-কসুরে।
যত বেচ চাল ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।।
যত বৈসে দ্বিজবর কার নারি নিব কর
চাষভূমি বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণে দাস পূরিব সবার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান।"[৫]

মার্কসের আবেদনকে কেই কেউ মূলত বিমূর্ত বা ভাবপ্রধান চিন্তা (ideology) হিসেবে পরিগণিত করতে

চান। মার্কসের চিন্তাধারা বা তত্ত্বের মধ্যে যে ত্রুটি থাকুক না কেন তাঁর মূল্য উদ্দেশ্য কিন্তু শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাই যে কোনো দেশের আর্থিক বা সামাজিক প্রসারের কথা যখন ওঠে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ওই বিমূর্ত ধারণা—শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও এসে পড়ে। বুলানন্ডলের প্রতি কালকেতুর পূর্বোক্ত আশ্বাসবাণীতে বস্তুত তারই প্রতি বনিকে শুনতে পাওয়া যাবে। এ কাব্যের দেবী চন্ডী পশুদের ক্রন্দন নিবারণার্থে যে সামূহিক প্রয়াস নিয়েছেন, তার মধ্যেও একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সামাজিক গূঢ় অভিপ্রায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন শুধু তো অর্থনৈতিক ঘটনামাত্র নয়, সামাজিকও বটে। তাই সমাজের কথা উঠলেই মার্কসের চিন্তাভাবনাকে স্থান দিতেই হয়। তাঁর মতে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের (Base) উপর গড়ে ওঠে যে পরিকাঠামে (Superstructure) তাই-ই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল নিয়ন্ত্রক। এ কথা সত্য কালকেতু কেবল আদর্শ অর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে তাই নয়, গুজরাট নগরে নানা নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের লোকের একত্র সহবাসের বন্দোবস্ত করে সম্প্রীতির বাতাবরণ রচনা করেছে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যরক্ষায়ও প্রয়াসী হয়েছে। মার্কসীয় সাম্যবাদের এ যেন আর এক অভিনব সামাজিক দৃষ্টান্ত বিশেষ।

মার্কস জানিয়েছিলেন, কোন একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ বা পুঁজিপতিরা শ্রমজীবী মানুষদের উদবৃত্ত অর্থকে অত্যন্ত সুকৌশলে হস্তগত করেন। কিন্তু পুঁজিপতিদের সব সময়েই এই ভয় থাকে যে তাঁরা প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যেতে পারেন। সেজন্য তাঁরা উদ্বৃত্ত মূল্যকে সঞ্চয় করেন। এই অভিমতের গ্রহণযোগ্যতার বিতর্কে যাচ্ছি না, তার আলোচনার ক্ষেত্রও আলোচ্য নিবন্ধ কখনোই নয়। কিন্তু মার্কসীয় ভাবনার এই আদল বা রূপরেখাটি চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কতকটা রক্ষিত। এ কাব্যের ব্যাধখন্ডে বণিক মুরারি শীলের মধ্যে পুঁজিপতিদের একটি আদলকে লক্ষ্য করা যেতে পারে কিনা অত্যন্ত দুঃশীল এবং সরল ব্যাধ কালকেতুকে অত্যন্ত কৌশলে প্রতারণা করে উদবৃত্ত মূল্য হস্তগত করতে চেয়েছে। যে আংটির দাম তৎকালীন বাজার দর অনুসারে সাত কোটি টাকা, তার সম্পর্কে ধূর্ত বণিকের মন্তব্য—

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্‌্যাছ উজ্জ্বল॥

এর ভিত্তিতে সে আংটির মূল্য 'অষ্টপণ পাঁচগন্ডা' টাকা বলে ধার্য করে। কালকেতুর ধার শোধ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বণিক ও বণিকপত্নী যে অভিনয় করেছে তার মধ্যেও কালকেতুর ন্যায় দরিদ্র ব্যাধকে প্রতারিত করে অর্থ শোধ না দেওয়ার বিশেষ অভিপ্রায় কার করেছে। মুরারির এই শঠতা ও পুঁজিবাদী মানসিকতাকে চিহ্নিত করেছেন মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিকও। জানিয়েছেন—

"মুরারি শীল জাতিতে বেনে—সে 'লেখা জোকা করে টাকাকড়ি'। সে বাংলার 'শাইলক'। সরল প্রকৃতির নিরক্ষর ব্যাধসন্তান কালকেতু তাহার নিকট একটি অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে মুরারির পরিচয় ছিল, এমনকি সে মাংসের জন্য 'দেড় বুড়ি' কালকেতুর নিকট ধারিত। কালকেতুর আগমনের আভাস পাইবা মাত্র, সে তাহার দেড় বুড়ি ধার শোধ করিতে হইবে এই ভয়ে বাড়ির ভিতর পলাইয়া গেল। বাণ্যানীটিও যে তাহারই উপযুক্ত পত্নী, সে বিষয়টিও কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই, কারণ, ইহা যে এই জাতিরই বৈশিষ্ট্য। সে মিথ্যা করিয়া বলিল,

ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতকপাড়া

কালি দিব মাংসের উধার।।
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন্য একভার, একত্র শুধিব ধার
মিষ্টি কিছু আনিহ বদর।।

বাণ্যানীর এই কথাগুলির মধ্যে তাহার দেড় বুড়ি শোষ দিবার আপাতত অনিচ্ছাটিকে যে কি কৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাতে বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না যে, বাণ্যানী জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবের জন্য তাহারই মুখ চাহিয়া বসিয়া ছিল না, কিংবা মিষ্ট বদরের জন্যও তাহার তেমন কোন ব্যগ্রতা নাই। ইহা শুধু উপস্থিত পাওনাদারকে এড়াইবার একটি চিরাচরিত অভ্যস্ত ও মুখ্য কৌশল। 'একত্র শুধিব ধার' কথাটি এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যে ব্যক্তি ধারে মাংস খাইয়া, তাহার 'দেড় বুড়ি' মাত্র শোধ দিবার ভয়ে ভিতর বাড়িতে গিয়া আত্মগোপন করে, সে এই দেড় বুড়ি সহ এক ভার কাষ্ঠের ও তৎসহ কিছু মিষ্ট বদরের মূল্য একত্র শোধ করিবে তাহা কল্পনার অতীত। ইহাও উপস্থিত ধার শোধ করিবার অনিচ্ছার একটি গতানুগতিক উপায় মাত্র। সে নিজে এক ধূর্ত মহাজনের স্ত্রী—অতএব ধার না শোধ করিবার বাচনিক আঙ্গিকসমূহে সেও সুপরিচিত। কারণ, এই ব্যবহার তাহার মহাজন স্বামীও খাতকের নিকট হইতে নিত্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই নারীর কথাগুলির মধ্য দিয়া এই পরিবারটির ব্যবসায় ও বৃত্তির একটি যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা এমন সার্থকতার সঙ্গে আর কি উপায়ে প্রকাশ করা যাইত, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না।"[৭]

মার্কসের সমাজনিরীক্ষা ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও তার যে একটি সর্বজনীন রূপ আছে, সে কথা আগেই বলেছি। সেই ভাব-রূপের সঙ্গে বিশ্বের তাবৎ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তনের তাত্ত্বিক বা পদ্ধতিগত দিকের কম-বেশি যোগ পরিলক্ষিত হয়। চন্ডীমঙ্গলের রচনাকাল মার্কসীয় তত্ত্ব-পদ্ধতির উদ্ভবের অনেক পূর্ববর্তীকালের। তবু এর অংশ বিশেষের সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য-কল্পনা একারণেই যে, সব যুগেই সমাজ-অর্থনীতির বিবর্তন কতকগুলি সাধারণ রীতি-প্রকরণ মেনে চলেই—বাহ্যিক ভিন্নতা যাই থাক না কেন। আজকের দিনেও চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনায় যখন সাহিত্যের পরিভাষা-প্রকরণ হিসেবে মার্কসীয় তত্ত্বভাষ্যের ব্যবহার বিদগ্ধ সমালোচককেও করতে দেখি, তখন মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান ধারার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের বিকাশ-বিবর্তনের সঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের সংযোগ-সমন্বয় বিচার আদৌ দোষের হবে না বলে মনে করি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিষয়টির প্রতি আগ্রহ বোধ করবেন বলেই আমার ধারণা।

উৎস নির্দেশ

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত। কবিকঙ্কন চন্ডী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬। পৃ: ৩০৪।
২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৬।
৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০।
৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ২০২।
৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৮-৩৩৫।
৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৪।
৭. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০৬। পৃ: ৪১৪-৪১৫।